এই সময়
সংবাদপত্র

কথা স রি ৎ

পাষাণ-গিরির বাঁধন টুটে নির্ঝরিণী আয় নেমে আয়।
ডাকছে উদার নীল-পারাবার আয় তটিনী আয় নেমে আয়।।
— কাজী নজরুল ইসলাম

প্রত্যাবর্তন

প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দ যেন স্বাভাবিকত্বে ফেরে, নতুন বছরের আশাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম অবশ্যই। কোভিড যে ভাবে জীবনচর্যার আদলটিকে পাল্টে দিয়েছে, তা থেকে মুক্তির জন্য মানবসমাজ উন্মুখ। সৌভাগ্যের কথা, সেই ক্রমমুক্তির একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছল ভারত। একাধিক রাজ্য স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অর্থাৎ পঠন-পাঠন গৃহান্তরাল থেকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে। ইঙ্গিতটি স্পষ্ট। অতিমারীর সংক্রমণ চলছে ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আপাতত। সংক্রমণ ও মৃত্যু, উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময় ধরে নিম্নমুখী প্রবণতা। যে সব রাজ্যে স্কুল খুলছে, তাদের দিকে অন্য রাজ্যগুলিরও নজর থাকবে। আশা করা যায়, তাদের দেখাদেখি অন্যরাও স্কুল খুলতে উৎসাহিত হবে। বিশেষত কোভিড-প্রতিরোধী টিকাকরণের কাজ যেহেতু অবিলম্বে শুরু হতে চলেছে, তা সাধারণ নাগরিক এবং রাজ্য সরকারগুলিকে স্বাভাবিকত্বে প্রত্যাবর্তনের ভরসা জোগাবে। দেশজুড়ে সিনেমা হলগুলির খুলে যাওয়াও আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই ক্ষেত্রটি কোভিড ও লকডাউনের ফলে সর্বাধিক পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রগুলির অন্যতম। ভারতে পরিষেবা ক্ষেত্র সব থেকে বেশি কর্মসংস্থানের জোগানদার। তদুপরি বহু অদক্ষ ও স্বল্প-দক্ষ কর্মীর রুজি-রোজগারের উপায়। শরীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম চালু থাকার দরুণ এই ক্ষেত্রটির সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে একটু বেশি সময় লাগবে। অতএব তাদের সরকারি সাহায্য প্রয়োজন।

কিন্তু কোভিড-সংক্রান্ত নিয়মবিধি যেন পালিত হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। স্বাভাবিকত্বে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত যদি নিয়মকানুন মেনে চলার অভ্যাসটিকে শিথিল করে, তা হলে আবার বিপদ বাড়বে। টিকাকরণ শুরু হতে চলেছে ঠিকই, কিন্তু এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে এই প্রক্রিয়াটি শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কাজেই সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্র ও নাগরিক, উভয়কেই প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলতে হবে, যেন সংক্রমণের ঝুঁকি কমে। সেটিই জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার প্রকৃষ্টতম পথ।। মনে রাখতে হবে, রেল-পরিষেবার মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবা চালু হলেও এখনও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেনি। সংক্রমণের ঝুঁকি কমলে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণও সহজতর হবে। সেটি জরুরি কারণ তার সঙ্গে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নটি জড়িত। কিছুটা সদর্থক চিহ্ন দেখা গেলেও এখনও অর্থনীতি সংকটাপন্ন। সেই নিরিখে স্কুল খোলার সিদ্ধান্তটি একটি ইতিবাচক বার্তা।

দায়িত্ববোধ

রেজিনগরের কাছে পিকনিকের গাড়ি উল্টে মৃত্যু হল ছ'জনের। এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রতি বছর অনেকটা যেন বা অমোঘ কোনও নিয়ম মেনে হয়। বনভোজনের মরশুম যেহেতু পেরোয়নি, তাই আমোদের স্রোতে বেএক্তিয়ার ভেসে চলা মানুষদের হঠাৎ কোনও জাদুমন্ত্রবলে আশ্চর্য রকম মানসিক পরিবর্তন না ঘটলে অমন বিপর্যয়ের সংবাদ ফের মিলবে এমনটা বলতে দ্বিধা নেই। মুশকিল হচ্ছে, এই মৃত্যুগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখা মানুষরা দেখেও শেখে না, এবং, যাদের সরাসরি অপূরণীয় ক্ষতি হল, তারা যে খুব একটা ঠেকেও শেখে, সে রকম নিদর্শনও নেই। অতএব,

১৯৯৫ সালে চণ্ডীগড় পার্টি কংগ্রেস থেকেই কংগ্রেস সম্পর্কে সিপিএম-এর মনোভাব নরম হতে শুরু করে

কতটা পথ পেরোলে তবে শরিক বলা যায় কমরেড

একদা 'পরম শত্রু' কংগ্রেস নিয়ে বামপন্থীদের ধারণা যদি পাল্টাতে পারে, তা হলে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও নতুন করে পর্যালোচনা হবে না কেন? লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

অভীক পুরকায়েত

গত বছর ২৫ নভেম্বর রাতে এক বন্ধুর মেসেজ ছিল 'এবার মারাদোনা। আর ভালো লাগছে না'। তখন মেসেজটি দেখতে পায়নি কারণ নিদ্রামগ্ন ছিলাম। ২৬ নভেম্বর ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায়। মেসেজ পেয়ে টেলিভিশন চালিয়ে খবরটি দেখে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল 'সত্য রে লও সহজে'। কারণ বন্ধু আমার মতোই আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের ফ্যান। তার কিছু দিন আগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বাঙালি হারিয়েছে। বন্ধু দুঃখ করেছে আর পাঁচটা বাঙালির মতো। সেই দুঃখ বেড়ে গেছে মারাদোনার প্রয়াণে। আধুনিক বাঙালির সংস্কৃতির মধ্যে সৌমিত্র এবং মারাদোনা দু'জনেই বামপন্থী ঘরানার প্রতীক। আরও পরিষ্কার করে বললে বিংশ শতাব্দীর বামপন্থী আইকন, দু'জনেই। এক দিকে আর্জেন্টিনার রাজধানী, বুইনস আইরসের ফাভেলা (বস্তি) থেকে উঠে আসা ফুটবলের রাজপুত্র আর অন্য দিকে 'কোনি'র বামপন্থী পেশাদার কোচ, ক্ষিতীশ সিংহ ওরফে খিদ্দা, যিনি দৃঢ়চেতা। সৌমিত্রবাবু আজীবন বামপন্থী মতাদর্শে অবিচল ছিলেন।

খিদ্দা-রা যেমন মরেন না, তেমন ১৯৮৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের স্মৃতি অমর হয়ে থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের কাছে। আশির দশকে ইউরোপে ক্লাব ফুটবল খেলার সময়, মারাদোনা ড্রাগের নেশায় আসক্ত হন। একেবারে গরিব পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষটি হঠাৎ ক্ষমতা ও খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে হয়তো মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেননি। পদস্খলিত হয়ে নিজের এবং নিজের পরিবারকে ভুগিয়েছেন। তুলনায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বরাবর অনুশাসন-প্রেমী। তাঁর আজীবন স্থৈর্যের জন্য আমরা বাঙালিরা চিরকাল শিখব যে অনুশাসন ও ধীরতা-স্থিরতা মানুষকে সাফল্যের কোন পর্যায় নিয়ে যায়। ২০০৭ সাল থেকে বহু বাঙালির অভিমান হয়েছিল যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কেন তাঁর বন্ধু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ছিলেন।

'সাঁঝবাতির রূপকথারা', 'অসুখ' এবং 'দেখা' ছবির পরিণত-বয়স্ক বাঙালি চাটুজ্জে মশাইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মতো উত্তমকুমারের অনুরাগী এক কাকুকে বলছিলাম, 'আচ্ছা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নামটা কখনও ভালো করে ভেবে দেখেছ? জাতপাত নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা বলবেন পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ রাজ্য সরকারের মুখ্য ভুমিকায় থেকে রাজত্ব করল। জ্যোতি বসু কায়স্থ। বুদ্ধবাবু এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলায় হয় সেই ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ মুখ্যমন্ত্রী। এবং সব আমলেই আমাদের বিখ্যাত 'আভাঁগার্দ' অভিনেতা স্বনামধন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রাজত্ব করলেন। এ ভাবে কখনও ভেবে দেখেছ? ঋত্বিক ঘটক যেমন বলেছিলেন 'ভাবো ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো, আমাদের কিছু হল না। তোমরা ভাবলে কাজ হবে'—ঠিক সেই কায়দায় ডায়লগ ঝেড়ে।

এতগুলো কথা বললাম কারণ অভিনয় এবং খেলার ক্ষেত্রে যেমন নক্ষত্র এবং আইকন হয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও আইকন লাগে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সমর্থককুল যেমন জ্যোতি বসুর পরে তেমন কোনও বড় আইকন খুঁজে পায়নি। বিংশ শতাব্দীর বামপন্থী আইকনদের যখন পতন হয়ে গেছে, একবিংশ শতাব্দীর বামপন্থী রাজনীতি করতে গেলে একবিংশ শতাব্দীর বামপন্থী আইকন দরকার। সে ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট নেতৃত্বকে ঠিক করতে হবে যে নতুন শতাব্দীর, নতুন প্রজন্মের সঠিক দাবিগুলোকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি লড়াই-আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে কী ভাবে নতুন নেতৃত্ব ও আইকন তৈরি করা যায়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি লড়াই-আন্দোলন হবে কার বিরুদ্ধে, সেই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে একবিংশ শতাব্দীর বামপন্থী রাজনীতি ভারতের মাটিতে জমি পাবে না। এক দিকে যখন জোরদার কৃষক আন্দোলন দিল্লির বুকে চলছে এবং যার অভিমুখ এখন কেবল মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং ভারতের বড় পুঁজির একাংশের বিরুদ্ধে, তখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট যদি মনে করে যে রাজনীতির ময়দানে তৃণমূল ও বিজেপি, উভয় দলই সমান শত্রু তা হলে কি সেটা কোনও সঠিক রাজনৈতিক লাইন হবে? আগামী ব্রিগেড সমাবেশ থেকে যদি বামফ্রন্ট নেতৃত্ব সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ভুল জনসমক্ষে স্বীকার না করেন, তা হলে কি বামফ্রন্ট বাংলার কৃষকদের সমর্থন জোগাড় করতে পারবে? খুব পরিষ্কার করে বামফ্রন্ট নেতৃত্ব যদি ব্রিগেডের সভা থেকে না বলেন যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে তাদের শিল্পায়নের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না কিন্তু সেই শিল্পায়নের জন্য জমি নিতে গিয়ে কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছিল, এহেন ভুল থেকে তাঁরা শিক্ষা নিতে চান এবং জনগণের ইস্যুগুলো নিয়ে লড়াই-আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান, তা হলে বাংলায় কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষ তাঁদের আর কেন ভরসা করবে?

এ কথা সবাই জানে যে আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে আরজেডি ও এনসিপি-কে বাদ দিলে কম বেশি সব আঞ্চলিক দল কখনও না কখনও বিজেপির সঙ্গে আঁতাত বা নির্বাচনী জোট করেছে এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গুলোতে (১৯৯৮, ১৯৯৯-২০০৪, ২০১৪-২০১৯ এবং ২০১৯-পরবর্তী সময়ে) শরিক হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে বামপন্থীরা তামিলনাড়ুতে ডিএমকে, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু দেশম এবং সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরে এনসিপি ও পিডিপির সঙ্গে নির্বাচনী জোট করেছে। ওই দলগুলি এক সময় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের শরিক ছিল। তা হলে তৃণমূল কী দোষ করল? বরং ২০০৬-২০১১ সালের মধ্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-রিজওয়ানুর-লালগড়-নেতাই আন্দোলনের সময় থেকে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে দূরত্ব বাড়ে। যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সিএএ-এনআরসির মতো ইস্যুতে বামফ্রন্ট আর তৃণমূলের মধ্যে অবস্থানগত পার্থক্য করা যাচ্ছে না, তখন সেই ২০১৪ সাল থেকে বামফ্রন্টের পুরাতন গান যার নাম 'তৃণমূল-বিজেপি আঁতাত', তা কি মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?

> বামপন্থীরা ডিএমকে, তেলুগু দেশম এবং সম্প্রতি এনসিপি ও পিডিপির সঙ্গে নির্বাচনী জোট করেছে। ওই দলগুলি এক সময় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের শরিক ছিল। তা হলে তৃণমূল কী দোষ করল?

গত ছয়-সাত বছর ধরে বামফ্রন্ট 'তৃণমূল-বিজেপি গোপন আঁতাত' বলে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু মানুষ তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করছে না। উপরন্তু ২০১৪ সাল থেকে বামফ্রন্টের ভোট ক্রমশ কমছে এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের একজন মাত্র প্রার্থী জমানত বাঁচাতে পেরেছিলেন। এখানে স্মরণ করা যায় যে ১৯৯৫ সালে চণ্ডীগড় পার্টি কংগ্রেসে বিজেপি আর কংগ্রেসের মধ্যে ফারাক করে বিজেপি-কে প্রধান রাজনৈতিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে গিয়ে রাজনৈতিক কৌশলের ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে দরকার পড়লে নির্বাচনী জোট গড়া যেতে পারে, এহেন আলোচনা বামফ্রন্টের বড় শরিক, সিপিআই(এম) করেছিল। সেই সময় কংগ্রেস আর বিজেপি, উভয় দলকেই সমান ভাবে রাজনৈতিক শত্রু বলার কয়েক বছর পর থেকেই কিন্তু কংগ্রেস সম্পর্কে সিপিআই(এম)-এর মনোভাব নরম হতে থাকে। ২০০৪ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে বামফ্রন্ট বাইরে থেকে সমর্থন করে এবং ২০১৬ সালে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন রফা করে বামফ্রন্ট। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করতে বদ্ধপরিকর বামফ্রন্ট। কিন্তু এক দিন যাদের রাজনৈতিক শত্রু বলা হয়েছিল, তারা যদি আজ বন্ধু হয়ে থাকে, তা হলে তৃণমূল দলটি নিয়েও বামফ্রন্টের একটি সঠিক মূল্যায়ন দরকার। এবং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই বঙ্গীয় আঞ্চলিক দলটি সম্পর্কে বামফ্রন্টের কোনও সিরিয়াস পর্যালোচনা নেই।

আশির দশক বঙ্গীয় বামপন্থী রাজনীতিতে নির্বাচনের দিক থেকে সব থেকে বড় সাফল্যের দশক। আশির দশকের সরকারি রাজনীতির মডেলটি, (দিল্লির বিরুদ্ধে হুঙ্কার, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে জোর লড়াই, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ভরসা দেওয়া, সরকারি ক্ষেত্র মজবুত করা ইত্যাদি) আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। এবং কিছু ক্ষেত্রে তৃণমূল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার সফল হচ্ছে একটি স্থায়ী সরকারকে আরও মজবুত করার ক্ষেত্রে। 'দিদিকে বলো', 'দুয়ারে সরকার' এবং 'পাড়ায় সমাধান' জাতীয় কর্মসূচির জনপ্রিয়তা সরকারি 'রিলিফ' দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। বামফ্রন্ট আমলে সরকারি রিলিফ মূলত পঞ্চায়েত ও পুরসভার মাধ্যমে চালু ছিল। তার সঙ্গে একটি দ্বিমেরু শাসনপ্রণালী চালু ছিল। এক দিকে বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী আর অন্য দিকে পার্টি সম্পাদক। এই দ্বিমেরু শাসন উপর থেকে নিচুতলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে (সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়েত ও পুরসভার প্রতিনিধি) কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করত সরকারি দল। দুর্নীতি রোধ করতে এই মডেলটি কার্যকরী হলেও অনেক সময় সরকারি প্রকল্পে টাকা খরচ হতে বিলম্ব হত। তুলনায় পাশের রাজ্য ওড়িশা ও বিহারের মতো মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে একটি আমলাকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা তৈরি করেছে তৃণমূল যেখানে টাকা খরচের ক্ষেত্রে মেজ-সেজ রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ কম। এহেন মাই-বাপ সরকারের মডেলটি কিন্তু বামফ্রন্ট, ওড়িশা ও বিহারে স্থায়িত্বের একটি মডেল হিসেবে উপনীত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এহেন মডেলটি রাজনৈতিক স্থায়িত্বের উদাহরণ হিসেবে যে আবির্ভূত হবে না তা কিন্তু হলফ করে বলা যায় না। এই মুহূর্তে বিজেপি-আরএসএস যখন গোটা দেশটি গুটিকয়েক মালিকের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে, তখন শ্রমিকের কথা, শ্রমের মূল্যের কথা যেমন খিদ্দা ভাবতেন তেমন করে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরা কি ভাববেন? এবং সে ক্ষেত্রে বিজেপি-আরএসএস ছাড়া যে আর কারও বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে সোচ্চার হওয়া ন্যাড়ার বেলতলায় বারংবার যাওয়ার ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে আশা করি বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ তা বুঝতে সক্ষম হবেন।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক